আর্টফাইন, ভল্যুম-০৫, জুন-২০২১, পৃ. ১৯ - ৩৩

ভারতীয় চিত্রকলায় আধুনিকতা আনয়নে সাহিত্যের সাহচর্য ও প্রভাব অনুসন্ধান

শারমিন জামান*

ভূমিকা :

ভারতীয় চিত্রকলার এক সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। ভারতের চিত্রকলার আধুনিকতার সূচনা নিয়ে নানা বিতর্ক ও ভিন্ন ভিন্ন মতবাদও প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মনে করেন কোম্পানি আমলে ভারতীয় শিল্পের সাথে পাশ্চাত্য শিল্পের সংমিশ্রণে যে কোম্পানি চিত্রধারার জন্ম হয় তার মাধ্যমে এ অঞ্চলে আধুনিকতার সূচনা হয়। আবার বহু জনের মতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ, জাপানি ও ভারতীয় শিল্পধারার সমন্বয়ে যে চিত্রশৈলীর প্রবর্তন করেন তার মাধ্যমেই সূচিত হয় আধুনিকতার বীজ; তবে বাংলাই যে এ অঞ্চলের আধুনিক চিত্রকলার কেন্দ্রস্থল তা নিয়ে বিরোধের অবকাশ নেই। সাহিত্য গোড়া থেকেই ভারতীয় চিত্রকলায় প্রভাব বিস্তার করে আসছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় পুরোটা সময় জুড়েই এর প্রভাব আমরা লক্ষ করি। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে এ ধারা অবলুপ্ত হয়। মুঘল পরবর্তী ও ব্রিটিশ শাসনের সময় এ চিত্রকলা নানা বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার দীর্ঘ পথ পার হয়ে আধুনিকতার সূচনা হয়। এ সময় পুরো ভারতবর্ষের চিত্রকলার নেতৃত্ব দেয় বাংলা এবং বিষয়বস্তু হিসেবে আবার ফিরে আসে সাহিত্য, যা একটি নতুন চিত্রশৈলীর জন্ম দিতে সাহায্য করে। সাহিত্য ও পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা উভয়ই এ চিত্ররীতির বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা সাহিত্যকে আধুনিক সমকালীন শিল্পীদের চিত্রে বিষয়বস্তু হিসেবে আসতে দেখি। বাংলার রেঁনেসা নামক খ্যাত বেঙ্গল স্কুলের হাত ধরে যে সাহিত্যনির্ভর আধুনিক চিত্রধারার সৃষ্টি হয় তা সমসাময়িক বাংলার চিত্রশিল্পের হৃৎস্পন্দন বলা যেতে পারে।

কোম্পানি শৈলীর অসারতা ও সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনায় রাখলে এ কথাই বলতে হয় যে এ অঞ্চলের আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়েই। তবে তার আগে ভারতীয় চিত্রশিল্পে আধুনিক যুগের শুরুর পেছনের কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

---

* **শারমিন জামান :** সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারতীয় চিত্রশিল্পে আধুনিক যুগের সুচনার প্রেক্ষাপট :

"ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ভারতীয় চিত্রকলার পথ যেন হঠাৎ এক অন্ধগলিতে এসে ফুরিয়ে গেল। যে মিনিয়েচার চিত্রণের ঐতিহ্য দিল্লীর মুঘল দরবার মনপ্রাণ দিয়ে লালন করে তাকে অপূর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছিল তার আয়ু নিঃশেষপ্রায় হল। মুঘল দরবারের কৃপায় যেসব প্রাদেশিক রীতি বা কলমের সৃষ্টি ও প্রসার হয়েছিল সেগুলোও স্তিমিত হল। ইতিমধ্যে যেসব ইউরোপীয় শৈলী ও রীতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে– যেমন পাটনা, লক্ষ্ণৌ, হায়দ্রাবাদে–দেখা দেয় সেইসব বিদেশি শিল্পী–বিশেষত ফরাসি, ব্রিটিশ এবং কিছু ওলন্দাজ–ভারতীয় শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ বা আগ্রহান্বিত করতে পারেননি, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ছিল এতই তফাত।" (মিত্র, ২০১৪:৬৭,ক)

> "ছবি আঁকার বিষয়ে মুঘল চিত্রশিল্পীরা উপকরণের ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে ছিলেন। মধ্য যুগ থেকে ভারতবর্ষে ছবি আঁকার উপযোগী কয়েক রকম দামি কাগজ তৈরি হত। এরকম কাগজের নাম ছিল *হারিরি* ওরফে *রেশমি*। হায়দ্রাবাদের দৌলতবাদে *দৌলতবাদী* বলে এক রকম শিয়ালকোটি কাগজও খুব চলত। আরেকটি ভাল কাগজ হত মহীশূরে তাকে বলত *কারদে*। বাঁশ থেকে যেসব কাগজ হত তাকে বলত *বাভসাহা* বা *ভাঁশি* কাগজ । পাট বা টাট থেকে যে কাগজ হত তাকে বলত *টাটাহা*। তুলা থেকে যে কাগজ হত তাকে বলত *তুলোট* কাগজ। আরেকটি কাগজ শণ থেকে হত, তাকে বলত *শুন্নি* কাগজ। *ঈরাণী* আর *ঈস্পাহাণী* বলে দুটি বিদেশি কাগজের খুব নামডাক ছিল। ছাগল, উট, কাঠবেড়ালি, নেউলের লোম থেকে তুলি হত। সিংহলে *টেলিটানা* বলে একরকম ঘাস দিয়ে তুলি তৈরি হত। শুধু জলের ব্যাপারও ছিল নানা রকম। এক ধরনের জল দেওয়া হত, তাকে বলত *আবিনা*; শুধু জল বুলিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হত, এতে জলের দাগ থেকে যেত। সেই দাগ ধরে নকশা আঁকা হত।"(মিত্র, ২০১০:১৩৯)

উনিশ শতকে একমাত্র পাঞ্জাবের পাহাড়ী রাজ্যগুলোতেই শুধু চিত্রকলা যথেষ্ট প্রাণবন্ত ছিল বলা যায়। পাহাড়ি রাজ্যগুলো থেকে আবার অনেক শিল্পী লাহোর ও অমৃতসরে শিখ দরবারে কাজ নিয়ে চলে আসেন। এ দুটি শহরে যেসব শিখ চিত্রকলার নমুনা পাওয়া যায় তার অনেক ছবি নিকৃষ্ট স্তরের। বিশেষত উনিশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপীয় নীতির প্রভাব বড় স্পষ্ট হয়। ব্রিটিশদের আগমনের ফলে এই উপমহাদেশের জনগণের মধ্যে ইউরোপীয় রুচি বিকাশের এক প্রতিযোগিতা তথা জোয়ার গড়ে উঠতে থাকে। তাঁরা মনে করলেন যে ভারতীয় শিল্পকলা বাস্তবতা বিবর্জিত এবং কারিগরি দিক থেকে যথেষ্ট দুর্বল। এই সময়ে ভারতীয় শিল্পীগণ এত বেশি পরিমাণে ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবিত হলেন যে তাঁরা ভাবতে শুরু করলেন যে যা কিছু ইউরোপীয় তাই উত্তম ও গ্রহণীয়, এবং যা কিছু দেশি তাই পরিত্যজ্য ও অগ্রহণযোগ্য। সেই সাথে এ দুটির মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে এক সংকর শিল্পরীতি। এই সময় একজন প্রতিভাবান শিল্পীর উন্মেষ ঘটল আর তিনি হলেন রাজা রবি বর্মা (১৮৪৮-১৯০৬)। পৌরাণিক কাহিনির চিত্র এঁকে তিনি অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ

করেন। তাঁর অলিওগ্রাফগুলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের ঘরে ঘরে শোভা পেতে থাকে। "শিল্প সমালোচকগণ অবশ্য তাঁর চিত্রকলাকে কখনই প্রশংসার চোখে দেখেনি। তাদের মতে রবি বর্মার চিত্রকলা নাকি আলোকচিত্রের অনুরূপ এবং এখানে নান্দনিকতার অভাব রয়েছে। ভারতীয় কাব্যিক এবং পৌরাণিক কাহিনি গুলোতে কবিত্বশক্তির অনুপস্থিতির কথাও বলেছেন।" (আলম, ২০০৩: ১২০) কিন্তু ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলা সৃষ্টির পেছনের প্রেক্ষাপট তৈরিতে রবি বর্মার শক্ত অবস্থান ও জনপ্রিয়তা অস্বীকার করা যায় না।

বাংলার তথা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা। আর এই কলকাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। শুধু তাই নয়, কলকাতা একটি বন্দরনগরী হবার কারণে এখানে গড়ে ওঠে বিশাল এক বাণিজ্যিক কেন্দ্র। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠায় শিল্পকলার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয় এটি। ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পথিকৃৎ হিসেবে বাঙালি আবির্ভূত হয়। বাঙালি বুদ্ধিজীবী শ্রেণি বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের ক্ষেত্রে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে যামিনী রায়ের একটি কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ : "সাধারণ লোকের জন্যে কালীঘাটের পট, বটতলার লিথোগ্রাফ হত; ওরই মধ্যে লেখাপড়া জানা মধ্যবিত্ত লোকদের জন্যে হত বৌবাজার আর্ট পট আর অয়েল পেইন্টিং, আর বড়লোক, জমিদার, রাজা-রাজড়ার জন্যে হত রবি বর্মা প্রভৃতির ছবি।" (মিত্র, ২০১৪:৫৪,খ)

উনিশ শতকের পুরো একশ বছরের শিল্পকলার ইতিহাস এই উক্তিটির মধ্যে পাওয়া যায়। দেশীয় শিল্পকলার যখন এই করুণ দশা, তখন ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনের এক বার্তা নিয়ে আসেন এক ভারতপ্রেমী ইংরেজ ভদ্রলোক ই. বি. হ্যাভেল। তিনি তৎকালীন ভারতীয় শিল্পীদের এটি অনুধাবন করাতে সক্ষম হন যে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই। তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের আহ্বান জানান। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাণী মর্মে ধারণ করেছিলেন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ চিত্রকলায় করতে সচেষ্ট হন, যা তাঁর শিষ্য ও প্রশিষ্যদের হাত ধরে ভারতীয় চিত্রকলায় সত্যিকার অর্থে আধুনিকতা আনয়ন করে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১- ১৯৫১)

প্রায় প্রত্যেক যুগে দেশে দেশে আচার-ব্যবহার, ধারণা ও রুচির বিবর্তনের ফলে একটা সাংস্কৃতিক আধুনিকতাই চিহ্নিত হয়। যেটির প্রভাবে শুধু বর্তমান নয়, অতীতেরও প্রতিষ্ঠিত নানা ধারণা প্রয়োজনমত রূপান্তরিত হয় এবং সমসাময়িক আধুনিকতার পরিসরভুক্ত হয়ে নব রূপ ও অভিব্যক্তিতে আত্মবিকশিত করে থাকে। সেই বিচারেই অবনীন্দ্রনাথ হচ্ছেন এ যুগের আধুনিক ভারতীয় শিল্পের জনক। চিত্রজগতে ভারতীয় শিল্পীর যে যথেষ্ট কিছু দেবার আছে, প্রাচ্য ও ইউরোপীয় মনের আদান-প্রদানের

কেন্দ্রস্থল ভারতীয় সমাজ থেকে এমন চিত্ররূপ উঠে আসতে পারে যার কাছে দুই জগতেরই কৃতজ্ঞ হবার যথেষ্ট কারণ থাকবে, এ কথা অবনীন্দ্রনাথের তুলিতে প্রথম স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ যদি নিছক চিত্রশিল্পী হতেন তবে বিশ শতকের প্রথম দিকে এই ধরনের জ্ঞান ও বোধ আসা শক্ত হত। কারণ তখনও কোন শিক্ষিত ভারতীয় শিল্পীরা ইউরোপীয় রীতির নকল করা ছাড়া অন্য কোন জগৎ আছে বলে জানতেন না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের ছিল সাহিত্যিক প্রতিভা; যা তাঁকে ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন করে এবং চিত্রকলা রচনায় চিন্তার খোরাক জোগায়। সে সময়ের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে স্বদেশিকতার জোয়ার ওঠে তাও তাঁকে এই নতুন ধারার শিল্প নির্মাণে উৎসাহিত করে। ইউরোপীয় রীতিতে দক্ষতা লাভ করলেও এ শৈলী তাঁর মনকে পুরোপুরি তৃপ্ত করতে পারছিল না। রবীন্দ্রনাথের উপদেশে তিনি বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে অবলম্বন করে আঁকলেন কৃষ্ণলীলা সিরিজ ১৮৯৭ সালে। মুঘল শাসনের পতনের ফলে সাহিত্যকেন্দ্রিক যে চিত্রকলা অস্তমিত হয়েছিল তা অবনীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পদ্মাবতী, বেতাল পঞ্চবিংশতি, অন্তিমশয্যায় শাজাহান ইত্যাদি অবনীন্দ্রনাথের বেশ উল্লেখযোগ্য চিত্র। মুঘল চিত্র আঙ্গিক, ব্রিটিশ স্বচ্ছ জলরং, জাপানি ওয়াশ পদ্ধতি আর নিজস্ব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তিনি তাঁর ওয়াশ টেকনিক বা ধৌত চিত্ররীতি প্রবর্তন করেন ১৯০৫ সালের আগেই। সামাজিক তাৎপর্য ও তাঁর নিজস্ব শৈলীর বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল 'ভারতমাতা' ছবিটি, এতে তিনি তাঁর ওয়াশ পদ্ধতিতে তখনকার স্বদেশি আন্দোলনের ভাবপ্রবণতায় দেশমাতৃকার 'প্রতিমা' রূপ দিয়েছেন। ধৌত বা ওয়াশ পদ্ধতিতে তিনি ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়াত' অবলম্বনে আঁকলেন এক সিরিজ

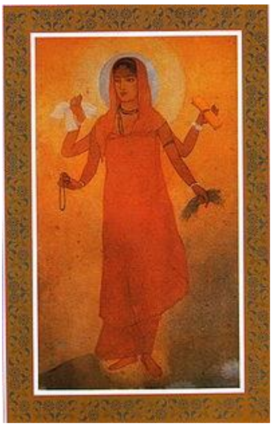

ভারতমাতা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

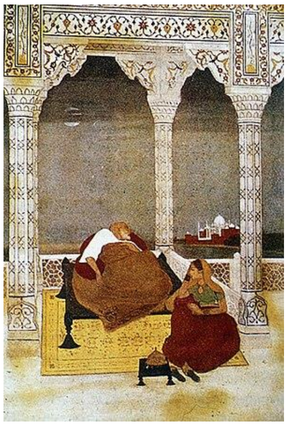

অন্তিমশয্যায় শাজাহান, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৯০৬-১১) চিত্র। অবনীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল মুঘল মিনিয়েচারের কাঠামো আর রূপসজ্জার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে নির্দেশিত 'ভাব' যুক্ত করে রসসমৃদ্ধ ছবি সৃষ্টি করা। অবনীন্দ্রনাথের অভিনব শিল্পানুসৃত তাঁর শিষ্যরা ও প্রশিষ্যরা ভারতের প্রাচীন হতে অতি নিকটতম অতীতের প্রতিষ্ঠিত শিল্পরূপ ও শৈলী বহির্ভূত এক নতুন শিল্পধারার অবতারণা করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য অসিতকুমার হালদার তাঁর গুরুকে নিয়ে লিখেছেন–

"চিত্রকলার কবি তুমি
আলোক-তুলি হাতে
ভারত বাণীর চিত্তটিরে
জাগাও আপনাতে।
বর্ণছটার সুরের মীড়ে
অঙ্গারেতে ফলাও হীরে
অমর রেখাপাতে।
রূপের দীপে অরূপ আলো
হৃদয় মাঝে তুমিই জ্বালো
রসের বেদনাতে।" (হালদার, ২০১৫: ১০৪)

এই অল্প কয়েকটি লাইনের মাধ্যমে কী অসাধারণ সুন্দরভাবে একজন মহৎ শিল্পীকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

নব্য বেঙ্গল স্কুল ও সমসাময়িক শিল্পীদের চিত্রধারায় সাহিত্যঃ

নব্য বেঙ্গল স্কুল এ অঞ্চলের চিত্রকলা চর্চায় বিশেষ গতির সঞ্চার করেছিল বলে পৃথকভাবে এ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। অবনীন্দ্রনাথ সরকারি আর্ট কলেজের উপাধ্যক্ষের পদে যোগ দেন ১৯০৫ সালে আর সেই পদে ইস্তফা দেন ১৯১৫ সালে। অবনীন্দ্রনাথ আর্টস্কুলে যোগদানের পর তাঁর প্রথম সারির ছাত্ররা হলেন– সুরেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার হালদার, দুর্গেশ চন্দ্র সিংহ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ দে, হাকিম মোহাম্মদ, কে ভেঙ্কটাপ্পা, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রমুখ। এঁদেরই হাতে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশৈলী একদিকে যেমন দৃঢ় ভিত্তিভূমি লাভ করেছে, অন্যদিকে নানা পথে প্রসারিত হতে পেরেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না তাঁরা সবাই রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব পদাবলী বা পারস্য ও আরব্য সাহিত্যকে উপলক্ষ করে চিত্র রচনা করেছেন। প্রথম থেকেই সুরেন্দ্রনাথ ও নন্দলাল ছবি আঁকার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। স্বল্পায়ু সুরেন্দ্রনাথের জীবনাবসান হয় ১৯০৯ সালে। মাত্র চার বছরের মধ্যে তিনি এমন কয়েকটি ছবি এঁকেছিলেন, যা প্রদর্শিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

চিত্ররসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর বখতিয়ার খলজির আক্রমণে লক্ষণ সেনের পলায়ন ছবিটি চিত্র হিসেবে বিশেষ প্রশংসিত হয়। এছাড়া মহাভারত লিখন, রাজা নুহাষের পতন, কার্তিকেয়, রামের সমুদ্র শাসন প্রমুখ ছবি খ্যাতি লাভ করে। নন্দলাল ও তাঁর সহপাঠীরা পাঁচ বছর আর্ট স্কুলে শিক্ষা নিয়ে ১৯১১ সাল নাগাদ বেরিয়ে আসেন। সতীর দেহ ত্যাগ, সতী, আহত মরাল হাতে সিদ্ধার্থের মত স্মরণীয় ছবি। এরপর ১৯০৯ সালে অজন্তা ঘুরে এসে এ সময়ের মধ্যেই নন্দলাল শিল্পী হিসেবে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে আঁকেন – শিব ও সতী, জতু গৃহদাহ, অহল্যার শাপমুক্তি, জগাই-মধাই ও অন্যান্য ছবি। ১৯১৫ এর মধ্যে আরও যুক্ত হলো পার্থ সারথি, শিব মুখমণ্ডল, শিবের বিষপান, যম ও নচিকেতা, মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠির প্রমুখ চিরায়ত চিত্রাবলি। নব্য ভারতীয় চিত্রকলার চরিত্র নির্ধারণে তাঁর এ ছবিগুলো যে গুরু অবনীন্দ্রনাথের ছবির মতই গুরুত্বপূর্ণ সেকথা সবাই স্বীকার করেন। নব্য বঙ্গীয় ধারার শিল্পীরা বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উদাহরণ।

সতী, নন্দলাল বসু

Gaganendranath Tagore
Fairy in the moon light

তাঁরা চিত্রপটে সাহিত্যকে শুধু সরাসরি বিষয় হিসেবেই উপস্থাপন করেননি, তা এসেছিল সে সময়কার সমসাময়িক রাজনীতির জনপ্রিয় বিষয় স্বদেশিকতার প্রতীক হিসেবে; অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকতা এসময় সরাসরি সাহিত্যকে চিত্রকলায় অনুপ্রবেশে সাহায্য করেছে।

বিশের দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে পুরো ইউরোপের মত উপমহাদেশেও চিরায়ত আদর্শ আর মূল্যবোধগুলোর প্রতি অবিশ্বাস দেখা দিয়েছিল, জেগেছিল নানা প্রশ্ন। জীবনের ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি এক পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। সাহিত্য ও শিল্পের আদর্শায়িত রূপের প্রতি আগ্রহ ক্রমেই কমতে থাকে। এমনকি যে স্বদেশি ভাবনার অনুপ্রেরণায় জন্ম নিয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের নব্য-বঙ্গীয় চিত্রধারা, তার চরিত্রও বদলে যেতে শুরু করেছিল। এসময় স্বদেশিকতার পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাও বিস্তার লাভ করেছিল; ছড়িয়ে পড়ছিল রুশ বিপ্লবের কথা। শিল্পও তাই রোমান্টিক পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট হল। এই পরিবর্তিত পরিবেশেই বাংলার চিত্রকলার বহুমুখী বিকাশ সূচিত হয়। আশ্চর্যজনকভাবে ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে শিল্পী প্রথম নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন তিনি হলেন অবনীন্দ্রনাথের অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি যে কেবল বাংলার চিত্রকলাকেই প্রকৃতার্থে আধুনিকতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন তাই নয়, সারা ভারতের চিত্রকলার ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। তিনি ইউরোপীয় চিত্রকলা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং তাঁর কল্পলোক বিষয়ক ছবিতে কিউবিস্ট ধারার সংমিশ্রণ ঘটান। "প্রগাঢ় অন্ধকার ও হীরকশুভ্র আলোর সংঘাতে স্ফুট অপরিস্ফুট ও প্রায় অস্ফুট আলোকের বিকিরণ তাঁর প্রবর্তিত নব্য কিউবিস্ট রীতির মধ্যে আমরা লক্ষ করি।" (ঘোষ, ১৯৯৫:৫২) গগনেন্দ্রনাথ যুবা বয়স থেকেই ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী ছিলেন। এছাড়া তার অভ্যাস ছিল প্রিজম এর ওপর সূর্যকিরণের প্রতিফলনে সাতরঙের ইন্দ্রজাল লক্ষ করা। সাত ভাই চম্পা কিংবা আলাদিনের গুহা এই প্রজম পর্যবেক্ষণরই ফলশ্রুতি। গগনেন্দ্রনাথ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ছবির আঙ্গিক নিয়ে তবে সাহিত্য তাঁর চিত্রে আগাগোড়াই বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে।

অসিতকুমার হালদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র। ১৮৯০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। অসিত হালদারের প্রথম জীবনের ছবিগুলো নন্দলালের মত গুরু অবনীন্দ্রনাথের শৈলীতে চিত্রিত হয়েছে। তারপর তার নিজস্ব একটা চিত্ররীতি গঠন করলেও তাতে গুরুর শিক্ষা বিদ্যমান। অসিতের চিত্রের মধ্যে সমাজ সমস্যামূলক চিত্র অপেক্ষা কাহিনি, গল্প ও পৌরাণিক চিত্রের আধিক্য অধিক ,দার্শনিক ও কাব্যিক ভাবের চিত্রও তাঁর তুলিতে চিত্রিত হয়েছে। চিত্রের বিষয় নির্বাচন করার ওপরও শিল্পীর শিল্পবুদ্ধি ও সার্থকতা অনেকটা নির্ভর করে। 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে' চিত্রে তন্ময় বাউলের মর্মকথা, একতারার সুরতরঙ্গ ধরে ধ্যানলোকে ছুটে চলেছে,

প্রভুর চরণতলে হয়ত সে সুরমালার মত জড়িয়ে গেছে। তবে কুমারসম্ভবের হরপার্বতী চিত্রখানি অসিতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র। কালিদাসের ‘কুমারসম্ভবম্’ বর্ণনার জীবন্ত রূপ দিয়েছেন চিত্রশিল্পী।“তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃত-মুদ্বহন্তী। মার্গচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ।” (দাস, ১৯৮২:৩৮১) নব্য বেঙ্গল স্কুলের ও সে সময়কার সকল শিল্পীদের চিত্রপট অনুসন্ধান করলে আমরা সাহিত্যের কোন না কোন অনুষঙ্গ পেয়েই যাব, তাই এই স্বল্প পরিসরে দীর্ঘ আলোচনার ক্লান্তিতে না যাওয়াই সমীচীন হবে। শুধু বিশেষ করে যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তাদের কথাই উল্লেখ করা হল।

যামিনী রায় (১৮৮৭–১৯৭২)

বিশের দশকের গোড়ার দিকে যামিনী রায় বাংলার পটচিত্রের আদলে আধুনিক চিত্রকলায় এক নতুন মাত্রা যোগ করলেন। তিনি জন্মে ছিলেন বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে। বেলিয়াতোড়ের অবস্থান সেই অঞ্চলে যেখানে পশ্চিমের উঁচুনিচু প্রান্তর আর দক্ষিণের সমভূমি এসে মিলেছে–সেই সঙ্গে মিলেছে দুই ভিন্ন সংস্কৃতি; বন্ধুর বনাঞ্চলের সাঁওতাল উপজাতির আর সমতলের বাঙালির। তিনি পাশ্চাত্যের একাডেমিক রীতি ও নব্য-বঙ্গীয় ধারা উভয় রীতিতে বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। তবে এসব ধারায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে না পেরে তিনি বাংলার নিজস্ব পরম্পরায় ছবি আঁকতে উদ্বুদ্ধ হন। নতুন করে অনুশীলন করেন বাংলার পটচিত্রের করণ-ধারণ। তিনি চিত্রকলার আদিমতম ও শুদ্ধতর রূপের দিকে ঝুঁকলেন, শিক্ষা নিতে থাকেন পটুয়াদের পাশাপাশি শিশুদের আঁকা ছবি থেকেও। বিষয় নির্বাচনেও প্রাধান্য পেল গ্রামীণজীবন আর গ্রামের মানুষের প্রিয় ধর্মীয় লোককাহিনি। তাঁর ছবি আশ্রয় করেছে রামায়ণের রচিত লীলা, এমনকি যিশুর জীবনকথাও। পাশাপাশি যামিনীর অনেক ছবিই হল সাঁওতালদের আর পটুয়াদের পটে কাহিনি বর্ণনার ধরণ আঁকতে কাহিনি, চৈতন্য জীবন, কৃষ্ণ-রাধা-বলরাম নিয়ে–তাদের মিলিত নৃত্যগীত, মাদল-বাদল, সাঁওতাল রমণীর প্রসাধন আর সাঁওতাল জননী ও শিশু। পটচিত্রের রং ও রেখায় এইসব কাহিনি বাস্তবধর্মিতাকে প্রতিফলিত না করে হয়ে উঠেছে প্রতীকধর্মী। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার চাপের মধ্যে, সামাজিক অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে তাঁর ছবি আশীর্বাদের মত, স্নেহস্পর্শের মতো কাজ করে। তাঁর পথ অনুসরণ করে পরবর্তী অনেক শিল্পীই আপন আপন চিত্রভাষা গড়ে তুলতে

গণেশ ও জননী দুর্গা

তিন পুজারিণী, যামিনী রায়

লোকশিল্পের ঐশ্বর্যের দিকে ঝুঁকেছেন। সাহিত্যনির্ভর বিষয়বস্তু নিয়ে এ অঞ্চলে যেসব শিল্পী কাজ করে গেছেন তাদের মধ্যে ছবির আঙ্গিক ও বিষয়গত উভয় দিক দিয়েই যামিনী রায়কে প্রথম সারিতে রাখতেই হবে।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪-১৯৮০)

বিনোদবিহারীর ছবিতে রূপ ও রঙের ব্যবহারে যে সরলীকরণ দেখা যায় তার সঙ্গে পটের রেখা ও দূরপ্রাচ্যের ক্যালিগ্রাফির সমন্বয় লক্ষ করার মতো। লোকশিল্পের সহজ সরল ও স্বপ্নাভাসে আকার গঠনের রীতিটি তাঁর ছবিতে পাওয়া যায়। যখন তাঁর সমসাময়িক শিল্পীরা ক্ষুদ্রাকৃতি মিনিয়েচার চিত্র রচনা করছেন, সেই সময় বিনোদবিহারী স্ক্রোল বা জড়ানো পট এবং ভিত্তিচিত্র নির্মাণ করেন। বাংলার পটের ধারাবাহিক কাহিনি উপস্থাপনের গুণ তাঁর ভিত্তিচিত্রে পাওয়া যায়। লোকশিল্পের মত খণ্ড খণ্ড ঘটনাকে একত্রে দেখানোর সঙ্গে তাঁর বর্ণনামূলক ছবির বাস্তবমুখী জীবন চরিত্রের উপস্থাপনায় যেন একই সুর খুঁজে পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের চীনা ও হিন্দি ভবনের দেয়ালচিত্র দুটিতে

গরুর পিঠে সাওঁতাল বালকেরা, বিনোদবিহারী মুখোপধ্যায়

প্রকাশ পায় সীমিত রঙের ছোপ ও ক্যালিগ্রাফিক রেখার সমন্বয়ে ঘনসন্নিবদ্ধ নিটোল রূপ ও ব্যঞ্জনা। হিন্দি ভবনের দেয়ালচিত্রটিতে সাধুসন্তদের জীবনকাহিনির আলেখ্য

চিত্রের মাধ্যমে বিনোদবিহারীর অধ্যাত্ম সাধনা সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে, যা শিল্পকলার জগতে এক পরম সম্পদ। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কারণেই হয়ত তাঁর চিত্রে মুহূর্তের আবেগের নাটকীয়তা নেই, বরং লক্ষ করা যায় সংগ্রামের স্তব্ধ প্রকাশ। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি ও রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রভাবেই হয়ত তিনি জীবনের এতখানি গভীরে যেতে সক্ষম হয়েছেন। আধুনিক অনেক ভারতীয় শিল্পীর দেখার সাথে বিনোদবিহারীর দেখার পার্থক্য এখানেই।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। বাংলা ভাগ হয়ে ভারতের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ বর্তমানের বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত পেল, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ রইল ভারতের অংশ হয়ে। ঐ সময় অনেক হিন্দু পরিবার যেমন ভারতের পশ্চিম বাংলায় চলে যায়, তেমনি অনেক মুসলিম পরিবারও চলে আসে পূর্ব পাকিস্তানে। সেই সময় বর্তমান বাংলাদেশের অনেক বিখ্যাত শিল্পী কলকাতা আর্ট কলেজের ছাত্র-শিক্ষক ছিলেন, যাঁরা দেশে ফিরে আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, মোহাম্মদ কিবরিয়া, শফিউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। দেশভাগ হলেও প্রকৃতপক্ষে দুই বাংলার মধ্যে ঐতিহ্যগত অখণ্ডতা বজায় ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে অনেক শিল্পী সাহিত্যকে বিষয়বস্তু করে ছবি আঁকেন বা আঁকছেন। তাঁদের সবার কথা এ স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এ ঘরানার শিল্পীদের মধ্যে কে. জি. সুব্রামানিয়াম, গণেশ পাইন, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত অনেক বেশি জনপ্রিয়, তাই এ অংশে শুধু তাঁদের কথাই স্মরণ করব।

কে. জি. সুব্রামানিয়াম (১৯২৪-২০১৬)

কলাভবনের ছাত্র সুব্রামানিয়াম ১৯৪৪ সালে নন্দলালের সাহচর্যে শান্তিনিকেতনে শিল্পশিক্ষা নিয়েছেন। ছেলেবেলা থেকেই সুব্রামানিয়াম ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের পুরোটাই সুব্রামানিয়াম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধারা নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। কোন ছবিতে ভারতীয় মিনিয়েচারের প্রভাব, কোন ছবিতে লোকশিল্পের নকশাধর্মিতা আবার কখনও পাশ্চাত্যের বাস্তবধর্মিতাও লক্ষ করা যায়। সত্তরের দশকের মাঝামাঝিতে তাঁর শিল্পদৃষ্টিতে এক জমাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রং মার্জিত অথচ উজ্জ্বল, রেখায় রয়েছে আনন্দঘন ছন্দ, কখনো বা শিশুসুলভ সারল্য। পটচিত্রের রেখা ও ভাবমূর্তি তাঁর এই ছবিগুলোতে বিশেষ আবেদন জাগিয়ে তোলে। বিষয় হিসেবে এসেছে দর্শন, পৌরাণিক কাহিনি ও নিজস্ব অন্তর্ভাবনা। এই ধারার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবি হল বেড়ালসহ রমনি সিরিজ, যেখানে প্রতিমার আদলে মুখমণ্ডলে ভক্তিমূলক ভাব বিরাজমান। সুব্রামানিয়াম তাঁর অনেক ছবিতেই কাল্পনিক রূপ উপস্থাপিত করেছেন তবে তা অনেকটা প্রতীকধর্মী, যেমন চার চক্ষু বিশিষ্ট দানব, পেখমযুক্ত গোপী বা গোপীনী ইত্যাদি। ১৯৮০ সালে আঁকা উড়ন্তপরী,

দেবী ও ষাঁড়, স্বপ্ন তাঁর কল্পনার সাথে যুক্ত হয়ে ছবিতে গল্পের সৃষ্টি করেছে। ধীরে ধীরে এই গল্প বা কাহিনি সৃষ্টির গোয়ালপাড়ায় দেবী নামক ছবিগুলোতেও এই বিশেষ রূপ কল্পনার উপস্থিতি লক্ষণীয়। পেছনে ফেলে আসা স্মৃতি বা আধুনিক প্রবণতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে সুব্রামানিয়ামের চিত্রকলা আজ এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে; যেন বিমূর্ত প্রকাশে পশ্চিমী ভাবধারায় ভারত দর্শন।

গণেশ, কে জি সুব্রামানিয়াম

Counting the Shadow, K G Subramanyan

গণেশ পাইন (১৯৩৭-২০১৩)

গণেশ পাইনের ছবির রূপকল্পনা স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্রতার অর্থময়তা প্রধানত দুটো ধারায় প্রসারিত: প্রথমত বর্ণনামূলক, দ্বিতীয়ত রূপকথার কাব্যময় জগৎ। লোকায়ত সারল্য সমৃদ্ধ প্রতিমাবিন্যাসের পথ তিনি বেছে নিয়েছেন। অতীতকে বাদ দিয়ে যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্মাণ সম্ভব নয় এ বিষয়ে তিনি যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। ছেলেবেলায় তাঁর চারপাশে যে রূপজগৎ সৃষ্টি হয়েছিল তারই বহিঃপ্রকাশ রয়েছে শিল্পী গণেশের বর্তমান চিত্ররচনায়। গণেশ পাইনের মানসিকতার ভিত্তি গঠিত হয় তাঁর পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল থেকেই। শিল্পীর পরিবারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি অত্যন্ত যত্ন ও শ্রদ্ধা নিয়ে মেনে চলা হত। এই পরিবেশের একটি প্রচ্ছন্ন প্রভাব তাঁর ছবির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। চিত্রের বিষয় হিসেবে প্রবলভাবে উপস্থিতি লক্ষ করা যায় লোককাহিনি ও রূপকথা থেকে মহাকাব্য পর্যন্ত নানা বিচিত্র কাহিনির। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে বৈষ্ণব

এবং শাস্ত্রীয় সংগীত, ভিক্ষুকের কণ্ঠে শোনা বাউল ও দেহতত্ত্বের গান ইত্যাদি। ভারতবর্ষের ছোটমাপের ছবি বিশেষ করে কাংড়া, বাসুলী, পাহাড়ি মিনিয়েচার তাঁকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করে। মধ্যযুগের এ রীতি অনুসরণ করে ১৯৬৮ সালের দিকে টেম্পারা পদ্ধতিটিকে নিজের চিত্র মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন। রেখা এবং গঠনের সরলতায়

The Head and the Black Moon, Ganesh Pyne

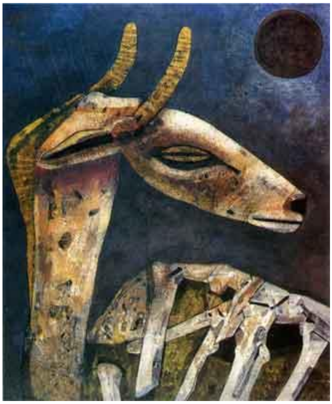

Night of the Marchent, Ganesh Pyne

লোকশিল্পের প্রভাব আমরা এখানে দেখতে পাই। গণেশের চিত্রকল্পে পাওয়া যায় লোকায়ত বর্ণনাক্রমে কাব্যিক অভিব্যক্তি। গণেশের ছবিতে অদ্ভুত পটভূমি আর অস্বাভাবিক সব আকৃতির অনেকগুলোই তাঁর ঠাকুরমার কাছ থেকে শোনা গল্প থেকে নেওয়া। ষাটের দশকে আঁকা ভারতীয় মিনিয়েচার চিত্র অথবা গুহাচিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত ছবিগুলোর মধ্যে আছে রাজকুমার, রাজকুমারী, রাজমুকুট ইত্যাদি। সত্তরের দশকে এসে গণেশ পাইনের ছবিতে নতুন দর্শন 'দ্বৈতসুরের' উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ সময়কার অনেক ছবিতেই নারীকে প্রকাশ করা হয়েছে গাছের রূপকল্পনার মধ্যদিয়ে, কখনো দেখা যায় কোন যোগী পুরুষের মুখ সাদা পায়রার মত অর্থাৎ দু-তিনটি ইমেজকে একটির মধ্যে সমন্বয় করে নতুন ভাষা খুঁজেছেন শিল্পী। 'যোদ্ধা' ছবিটি এই ধারার চিত্রের মধ্যে অন্যতম। লোকাচার, ইতিহাস অথবা সাহিত্য থেকে গণেশ পাইনের চিত্রের উদ্ভব হলেও মূল বক্তব্যে শিল্পীর ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণাগত রূপারোপ ঘটেছে।

ধর্মনারায়ণ দাশ গুপ্ত (১৯৩৯-১৯৯৭)

১৯৫৭ সালে ধর্মনারায়ণ কলাভবনে ভর্তি হন এবং ১৯৬১ সালে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তেলরঙের চাইতে জলরঙে তিনি যেন অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি ধর্মনারায়ণের ছবিতে ফ্যান্টাসিধর্মী রূপের সংযোগ হতে থাকে। পশ্চিমা ধারা

নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়েই তিনি সত্তরের দশকে তন্ত্র নিয়ে কিছু ছবি আঁকেন যা তাঁকে ভারতীয় পরম্পরা আর ঐতিহ্য নিহিত মন্ত্রে প্রতিভাসিত করে। মানুষ ও পশুর সংমিশ্রণ দেখা যায় তাঁর ছবিগুলোতে। আধুনিক সমাজের নিষ্ঠুরতা, রাজনৈতিক হঠকারিতা, দুঃস্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকার বেদনা ক্রমেই তাঁর ছবিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধর্মনারায়ণের ছবি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বর্তমানে তাঁর প্রায় সব ছবিতেই লোকশিল্প ও পরম্পরার চেতনা বর্তমান। বক্তব্যপ্রধান তাঁর ছবিগুলো আমাদের যেন রূপকথার রাজ্যে পৌঁছে দেয়।

Dharmanarayan Dasgupta, *Hero*, Acrylic on Canvas

'দ্য ভিশন', ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত

মুঘল প্রাসাদের গবাক্ষে রাজকুমারী বেশিনী উড়ন্ত নায়িকা দর্শককে ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও স্বপ্নলোকে নিয়ে যায়। জলে প্রাসাদের ছবি উল্টো, সাপের ফণার ওপর দাড়িয়ে দুষ্টু ছেলে প্রজাপতি ধরছে, পেছনে অনুচিত্রের আদলে গাছ–অর্থাৎ জীবনে প্রতিদিনের ব্যর্থতার মধ্যেও মানুষ স্বপ্ন দেখে; এই স্বপ্নই তাকে বাঁচিয়ে রাখে, নতুন করে উদ্দীপনা জোগায়। বক্তব্যপ্রধান ধর্মনারায়ণের এই ছবিগুলো খুব সহজেই ঊনবিংশ শতাব্দীর কালীঘাটে প্রতিমাকুলের আপাত সরল রচনাশৈলীর কথা মনে করিয়ে দেয়। ইনসার্চ অব ড্রিম, দুই নারী, বিটারবেন্ড ইত্যাদি এ ধরনের চিত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাঁথা শিল্পের ভাসমান প্রতিমা তাঁকে ছবিতে স্বপ্ন দেখাবার প্রেরণা জুগিয়েছে।

"মধ্যযুগের ভারতীয় অনুচিত্রের জগৎ তাঁর কাছে এক মুক্তির ইশারা এনেছে। এর ভেতরে আছে কল্পমায়ার পরিমণ্ডল, সেটা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। মুগ্ধ করেছে অনুচিত্রের বর্ণ ও বৈভব। আঙ্গিকে প্রাচ্যচেতনা এবং বিষয়ে সমাজ ও সমকালচেতনা এই দুইকে মিলিয়ে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন নিজস্ব আঙ্গিকের এক চিত্রমালা, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক সমন্বয়কে সম্পূর্ণ করে তোলেন এভাবে নিজের কাজের মাধ্যমে।" (ঘোষ,২০০৬: ২২৮)

উপসংহারঃ

এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, প্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য রীতি, মধ্যযুগের অতি উচ্চমানের সাহিত্য কেন্দ্রিক অনুচিত্রের সমন্বয়ে এই ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিকতার সূচনা ঘটে। পথিকৃৎ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, তাঁর সৃষ্ট নব্য বেঙ্গল স্কুল এবং উনার প্রথম দিকের ছাত্ররা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উন্নত চিন্তা-চেতনা নিয়ে যে শিল্পরীতির সূত্রপাত হল তা অল্পকাল পরে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ল। ফলে শিল্পকলা হয়ে পড়ল দুর্বল এবং বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে শুরু হয় এর অবক্ষয়ের পথে হাঁটা। অবক্ষয়ের মূল কারণ অনুকরণ ; শিল্পীরা অজন্তা, মুঘল ও রাজপুত শিল্পকলার অনুকরণ শুরু করলেন। শিল্প তার সৃষ্টিশীলতা হারাল, শিল্পকলা হয়ে পড়ল প্রাণহীন। কলকাতা গোষ্ঠী, রবীন্দ্রনাথের ইউরোপমুখী চিত্রকলা, এফ এন সুজা এবং এম এফ হুসেনের নেতৃত্বাধীন মুম্বাইতে প্রগ্রেসিভ গ্রুপের প্রতিষ্ঠা, অমৃতা শেরগিল ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলায় নতুন মাত্রা যোগ করেন। তবে এটি লক্ষণীয় যে অজন্তা, মুঘল বা রাজপুত ঐতিহ্য এখনকার আধুনিক শিল্পীরা আর সরাসরি অনুকরণ বা অনুসরণে সচেষ্ট হননি। এ যুগের শিল্পীরা নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিয়োজিত। বিশ্বশিল্পের বিস্তৃত অঙ্গনে ভারতীয় আধুনিক শিল্পীগণ এক নতুন মাত্রা সংযোজনের প্রচেষ্টায় ব্রতী এবং তাঁদের এই প্রচেষ্টা আজ অনেক খানি স্বীকৃত; কিন্তু ভারত চিত্রে আধুনিকতা আনয়নে এবং তার বিস্তার লাভে সাহিত্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।

তথ্য নির্দেশিকা

আলম, ড. রফিকুল (ফেব্রুয়ারি ২০০৩) উপমহাদেশের শিল্পকলা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১২০ ।

ঘোষ, মৃণাল (দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০০৬) পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকলায় ১৯৬০-এর দশক এবং দশজন শিল্পী, প্রিয়বত দেব, প্রতিক্ষণ, ৭ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২২৮।

ঘোষ, নির্ম্মলকুমার (৩য় মুদ্রণ ১৯৯৫) ভারত শিল্প, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

হালদার, অসিতকুমার, (সেপ্টেম্বর ২০১৫) শিল্পকথা, সম্পাদনা সুশোভন অধিকারী, গুণেন শীল, পত্রলেখা ১০ বি কলেজ রোড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১০৪।

মিত্র, অশোক (৫ম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১০) ভারতের চিত্রকলা (প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা , পৃষ্ঠা-১৩৯।

ভট্টাচার্য, অশোক (২০ মে ১৯৯৪) বাংলার চিত্রকলা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা।

মিত্র, অশোক (৬ষ্ঠ মুদ্রণ, জুলাই ২০১৪) ভারতের চিত্রকলা (দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬৭,৫৪ (ক)(খ)।

দাস, শ্রীকৃষ্ণলাল, শিল্প ও শিল্পী (নভেম্বর ১৯৮২) প্রাচ্য শিল্পকথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০১৩।